সুরাইয়া আপার নিরুপম যাত্রা

সুরাইয়া আপাকে নিয়ে লিখবো, এটি আমার জন্য একটি আকস্মিক ঘটনাই বলতে হবে। আমি এর জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আপার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে সালিলা-র (সৈয়দা সালিলা খানম সালাউদ্দিন, ডঃ সুরাইয়া খানমের একমাত্র কন্যা) ই-মেইল পাই ২৬শে মে, ২০০৬-এ। প্রবহমান সময় কারো কারো জীবনে কখনও কখনও থমকে যায়। মনে হলো আমার সেরকমই হলো। প্রথমে ভেবেছি এটা সাময়িক, কেটে যাবে। স্মরণপকালের ভিতর কখনও এমন হয়নি আমার। মনে হলো, বুকের ভেতর কোথায় যেনো একটা সুঁতো ছিঁড়ে গেছে, আর কোনোদিন জোড়া লাগবে না। কেমন একটা নিশ্চেতনতা এসে ভর করেছে দেহের উপর! ব্যাপারটি সম্ভবতঃ আমার অবচেতনায় একদম গেঁথে গিয়েছে।
সুরাইয়া আপার সঙ্গে আমার পরিচয়, কথোপকথন গত তিন বছর ধরে, ২০০৩ থেকে। প্রচুর কথা বলেছি বিভিন্ন সময়ে, কখনো কখনো ঘন্টা ছাড়িয়ে। কথা বলতে বলতে সময় গড়িয়ে যেতো খুব দ্রুত। এই অল্প সময়ে আপা কখন যে আমার হৃওদয়ের এতো কাছে চলে এসেছিলেন টের পাইনি। মনটা অদ্ভূতরকমে বিষন্ন হয়ে আছে সেই ২৬ তারিখ সকাল থেকেই, আজও, এখনও।

সুরাইয়া আপাকে নিয়ে আমার ভাবনাগুলো ছোট ছোট এবং থোকা থোকা — যে গুলো দিয়ে একটি একক মালা গড়ে তোলা আমার জন্য দুঃসাধ্যই। তাঁর মতো একজন এতো বড়ো মাপের মানুষকে বিশেষ করে ওনার চরিত্রের, ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিকতার সবগুলো দিককে ধরা বা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব। সুরাইয়া আপাকে নিয়ে ভাবতে বসলে প্রথমে তিনি ছায়ার মতো ভেসে ওঠেন। তারপর একটু একটু করে আলো ঢোকে সে ছায়ায়। যতো আলো প্রবেশ করে, ততোই উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন সুরাইয়া আপা আমার চোখে, ততোই উপলব্ধি করতে পারি কতোটা বিস্তৃত ছিলো তাঁর ভুবন! কতোটা সমৃদ্ধ ছিলো তাঁর পৃথিবী! সুরাইয়া আপা প্রথম আমার কাছে ছিলেন রবি ঠাকুরের উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’-র ‘লাবণ্য’ হিসেবে। অথবা বাংলাদেশের কীট্স বলে খ্যাত অকাল প্রয়াত কবি আবুল হাসান-এর ‘ভালোবাসা’ হিসেবে, যিনি তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘পৃথক পালঙ্ক’ উৎসর্গ করেছিলেন ‘সুরাইয়া খানম’ নামের এক অসাধারণ নারীকে। সে আমার কাছে তখন রহস্যময়ী ‘সুরাইয়া খানম’, যে রহস্য কখনোই পুরোপুরি উন্মোচিত হয় না সাধারণ মানুষের কাছে। শুধু রবি ঠাকুরের ‘শেষের কবিতা’-য় ‘লাবণ্য’-র ভূমিকায় অভিনয় কেনো, আমি বুঝতে পারি, তাঁর মেধা, কবিতা, জীবন-দর্শন, গবেষণা, প্রতিভা, সৌন্দর্য, খ্যাতি-অখ্যাতি সবকিছু মিলিয়ে সুরাইয়া খানম ছিলেন সমকালীন বাংলাদেশে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত ব্যক্তি। যিনি ছিলেন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রবর্তী। ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন সুরাইয়া আপা। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সনাতন পদ্ধতি, প্রথাগত মূল্যবোধ, নিয়ম ও কাঠামোর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। যে সমস্ত অভিধায় অভিষিক্ত হয়ে একজন মানুষ মহৎ বা মহতী হয়ে ওঠেন, কিংবদন্তী হয়ে ওঠেন, তাঁর প্রায় সবগুলোই সুরাইয়া আপার মধ্যে ছিলো। সুরাইয়া আপা এতো বেশী গুণের অধিকারী ছিলেন যে আমার লিখতে বসে ভয় হচ্ছে কোন্‌টা আবার বাদ দিয়ে ফেলি নিজের অজান্তে।

অসাধারণ, দূর্লভ এই সুরাইয়া খানমের জন্ম ১৩ই মে, ১৯৪৪ সালে। যশোহরে। স্কুলজীবন থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। ‘সমকাল’-এ প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর প্রথম কবিতা। নাচ ও গানেও তখন সমান পারদর্শী ছিলেন। এস.এস.সি (তখনকার ম্যাট্রিক) পাশ করার পর তিনি করাচীতে পড়াশুনা করেন এবং পরবর্তীতে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব কনিষ্ঠা অধ্যাপিকা হিসেবে কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন। এরপর কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স গ্রাজুয়েশন করেন। তিনি ছিলেন ক্যামব্রিজের ‘ট্রাইপস্’ বা ট্রিপল অনার্স। উল্লেখ্য যে, সুরাইয়া খানম ছিলেন

সাবকন্টিনেন্টের একজন প্রথম কমন্ওয়েলথ স্কলার ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ সময় তিনি বিবিসি-তেও কিছুকাল কাজ করেছেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে সুরাইয়া খানম স্বাধীনতার পক্ষে ইংল্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি তখন প্রবাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে একজন সক্রিয় ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। সে সময়ে লন্ডনে যে স্বল্পসংখ্যক বাঙালী নারী দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন, সুরাইয়া আপা ছিলেন সে তালিকার শীর্ষে। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সে অনন্য অবদানের জন্যেই, ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয়ের পর, লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ার-এ আয়োজিত বাঙালীদের বিজয় অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন লাল-সবুজ জাতীয় পতাকাটি উত্তোলনের ভার পরে সুরাইয়া আপার-ই ওপর। এ দূর্লভ স্মরণীয় মুহূর্তটিকে সামনে রেখে সুরাইয়া আপার একটি অনবদ্য কবিতাও আছে, 'পতাকা' শিরোনামে।

বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেন। একই সময়ে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হলের 'হাউস টিউটর' হিসেবেও। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রী হয়েও চমৎকার বাংলা কবিতা লিখতেন, যা শুরু হয়েছিলো ছোটবেলা থেকেই। সুরাইয়া আপার বেশকিছু ইংরেজী কবিতা আছে, আছে অনুবাদ কবিতাও। আছে অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, উপন্যাস, কিছু গবেষণা এবং বেশ কিছু কবিতা। ১৯৭৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর প্রথম ও একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'নাচের শব্দ'। থিয়েটার-এর প্রতিও সেসময় তাঁর আগ্রহ পরলক্ষিত হয়। সে সময়টিতেই বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বনামধন্য নাট্যকার, পরিচালক, প্রযোজক আতিকুল হক চৌধুরী প্রযোজিত নাটক, রবি ঠাকুরের উপন্যাস 'শেষের কবিতা'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র 'লাবণ্য'-র ভূমিকায় অভিনয় করে সারা দেশে আলোড়ন তোলেন।
এরপর '৮০-এর দশকের শুরুতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য একজন ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের University of Arizona-তে আসেন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ ও পরবর্তীতে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর Dissertation (গবেষণা)-এর বিষয়বস্তু ছিলো "Gender and the Colonial Short Story: Rudyard Kipling and Rabindranath Tagore (England, India)". পি.এইচ.ডি শেষ করে যোগ দেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে অ্যারিজোনার-এর একটি ইউনিভার্সিটিতে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন অ্যারিজোনার-এর টুসান শহরে। একজন শিক্ষকের বিশেষতঃ উচ্চতর শিক্ষায় যে প্রজ্ঞা ও পুঁথিগত ঋদ্ধি থাকা প্রয়োজন, তা সুরাইয়া আপার ছিলো। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বইমেলা, কবিতা উৎসব, সেমিনার সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন এবং অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহন করতেন।

প্রচুর লিখলেও বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সুরাইয়া আপা বরাবরই অমনোযোগী ছিলেন। এই অনাগ্রহের কারণ হতে পারে তাঁর সীমাহীন ব্যস্ততা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো ও গবেষণার কাজে তাঁকে প্রচুর সময় দিতে হতো। আমার জানা মতে সুরাইয়া আপার অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলো (আরও বেশী হতে পারে) হচ্ছেঃ
কাব্যগ্রন্থ — 'অভিমানের বাঁশী', 'বীজতলার গান', 'কালো মানুষের ক্বাসিদা'।
উপন্যাস — 'মহিলা', 'নীল আসমানের পরী'।
গবেষণা গ্রন্থ — 'সাম্রাজ্যবাদ ও ঊনিশ শতকের উপন্যাস'।

তাছাড়া নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে সাপ্তাহিক 'প্রবাসী' ও 'ঠিকানা'-তে তাঁর অনেক কবিতা, প্রবন্ধ ও কলাম নিয়মিত প্রকাশিত হতো, যা একসঙ্গে বই আকারে প্রকাশের কোনো

উদ্যোগ এখনো নেয়া হয়নি।

সুরাইয়া আপার সাথে আমার পরিচয়, কথা বলা, তাঁর লেখা পড়া, কবিতা পাঠ করা আমার জীবনের একটি বিশাল অভিজ্ঞতা। তাঁর থেকে জেনেছি অনেক। শিখেছি অনেক। বিশেষ স্নেহ করতেন আপা আমাকে। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রী বা একটু আধটু লেখালেখি করি বলি কিনা জানিনা, উনি আমার সঙ্গে কথা বলতে খুব পছন্দ করতেন। তাছাড়া কবি ও কবিতার প্রতি ছিলো সুরাইয়া আপার অন্যরকম দূর্বলতা — প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং সীমাহীন আগ্রহ। স্ট্রোক হবার সপ্তাহ দুয়েক আগে, আমি নিউইয়র্কে মুক্তধারার বইমেলায় যাচ্ছি শুনে জানতে চেয়েছিলেন, বইমেলায় বাংলাদেশ থেকে কবি শামসুর রাহমান আসবেন কিনা। কে কে আসছেন, এসব। পরে কবি শহীদ কাদরীর ফোন নম্বরটি চেয়ে নিয়েছিলেন কথা বলবেন বলে। গতবছর (২০০৫) নিউ অরলিন্সে যখন হারিক্যান ক্যাটরিনা আঘাত হানে, আমি ও আমার ফ্যামিলি Evacuate করে চলে যাই টেক্সাসে, আমার বড়ো ভাইয়ের বাড়িতে। কাউকে জানানোর মতো সময়ও ছিলো না। হ্যারিকেনের কারণে আমাদের সেলফোনও তখন কাজ করছিলো না। সেলফোনে না পেয়ে প্রায় সবাই ই-মেইল করে আমাদের খবর নিয়েছেন। মাত্র ২/৩ জন আমার ভাইয়ের বাড়ির ফোন নম্বর যোগার করে আমাকে অবাক করে ফোন করেছিলেন — আমার প্রিয় সুরাইয়া আপা তাঁদের একজন। টিভিতে হ্যারিকেনের তান্ডবলীলা দেখে উনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন আমাদের কথা ভেবে, আমাদের ছোট মেয়েটির কথা ভেবে, বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন। প্রচন্ড আবেগে আমার দু'চোখ চিক্‌চিক্‌ করে উঠেছিলো। আসলে ভালোবাসাতো এমনই কিছু দূর্লভ মুহূর্ত আর তার অনুভূতি!

সুরাইয়া আপার মৃত্যুসংবাদ জেনে মনটা আরো বেশী বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিলো 'সালিলা'-র কথা ভেবে। বিশেষ করে ওর ই-মেইল পেয়ে, হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত ওর লেখা ওর মায়ের জন্য Tribute-টি পড়ে। ২০০৩-এ হারালো বাবাকে, আর এখন মাকে—ওর আর কেউ রইলো না! এতোটুকু মেয়ে কী করে সামলে নিচ্ছে সব ভাবতে অবাক লাগে! বাবা-মায়ের যোগ্য সন্তান সে, মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়েই ছুটে এসেছিলো টুসানে ওয়াশিংটন থেকে ওর Graduation ফেলে, যে Graduation-এ সুরাইয়া আপার উপস্থিত থাকার কথা ছিলো। পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি, উনি যেনো সালিলা-কে যথেষ্ট মনের শক্তি দেন, এই কঠিন সময় মেয়েটি যেনো পার হতে পারে।

২০০৩-এ স্বামী সৈয়দ সালাউদ্দিন সাহেবের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ও আকস্মিক মৃত্যুর পর সুরাইয়া আপা সাময়িক ভাবে মারাত্মক ভেঙে পড়েন, যেটা খুবই স্বাভাবিক। তখনই, সে দিনগুলোতেই আপার সাথে আমার প্রথম কথা হয়। আমার তখন মনে হতো এক অবিশ্বাস্য স্তব্ধ সময় নেমে এসেছে তাঁর জীবনে। তবুও জীবন যাপিত হয় নিজস্ব নিয়মে। জীবনের টানাপোড়েনেরও শেষ নেই কোনো। মনে হতো, আজ আরও বেশী করে মনে হয়, এমনি টানাপোড়েনের অজস্র অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সুরাইয়া আপা অনুক্ষণ হেঁটে যাচ্ছিলেন। তবুও থেমে যান নি, ভেঙে পড়েন নি, হতাশাগ্রস্ত হন নি। ম্যাসিভ্‌ স্ট্রোক্‌টি আঘাত হানার দু'দিন আগেও রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসেছিলেন, প্রায়ই বসতেন - যেনো চিত্রিত বা নির্মান করতেন কিছু নিজেকেই ভেঙেচুরে। কোনো কিছুর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন কিনা জানি না! তবে এ যেনো অন্য জীবন। জীবনের বিপরীতে ভিন্ন জীবন। অন্য রকম অনুভূতি। যে অনুভূতি মানুষকে উজ্জ্বল করে তোলে। দর্শনের গভীরতায় ডুবিয়ে দেয়। যার সহজ ব্যাখ্যাও হয়তো মেলে না।

মরুময় অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের টুসানে আপা একা থাকতেন ২০০৩-এ স্বামী মৃত্যুর পর থেকে। 'আকাশলীনা'-র একটি কপি পাঠিয়েছিলাম আপাকে ২০০৪ সালে, মনে আছে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ 'আকাশলীনা' হচ্ছে একটি সাহিত্য সংকলন, যেখানে শুধুমাত্র প্রবাসী কবি-লেখক-লেখিকাদের নির্বাচিত লেখাগুলো নিয়ে আমি প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে (১৫ই এপ্রিল) এই সংকলনটি প্রকাশ করে আসছি ২০০১ সাল থেকে। সুরাইয়া আপা আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন আরও এগিয়ে যাবার জন্য এবং এটাকে ধরে রাখবার জন্য। এবছর ২০০৬-এ 'আকাশলীনা'-র জন্যে আপা তাঁর ৮ টি কবিতা আমাকে ফ্যাক্স করেন ফেব্রুয়ারীর শুরুতে, যার থেকে ৬ টি কবিতা আমি 'আকাশলীনা'-য় ছাপি। খুব সম্ভবতঃ প্রকাশের জন্যে নিজের হাতে পাঠানো এগুলোই সুরাইয়া খানমের শেষ কবিতা। বইটি দেখার জন্যে খুব উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। অন্ততঃ কিছুটা শান্তি পাই এই ভেবে যে, মৃত্যুর মাত্র দু'সপ্তাহ আগে বইটি আপার হাতে পৌঁছায়, আপা প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে আমাকে ই-মেইল করেন। এই ই-মেইল টিই আমাকে করা আপার শেষ ই-মেইল, আজও জ্বল জ্বল করছে আমার yahoo account-এ। এক জায়গায় একটু মজা করে লিখেছেন, 'মাত্র পেলাম, এখনো শুরু করিনি পড়া, আপাততঃ তোমার ছবিটা নিয়ে বসে আছি, দেখছি শুধু' (আকাশলীনা-র ব্যাক কভারে আমার একটি ছবি ছিল)। কথা ছিলো আমি নিউইয়র্ক বইমেলা থেকে ফিরে এলে 'আকাশলীনা'-র দোষত্রুটি নিয়ে আপা কথা কলবেন, উপদেশ দেবেন। সে সুযোগ আর হয় নি। বইমেলা-র প্রথম দিনই দিলারা আপার (দিলারা হাশেম) কাছে শুনি সুরাইয়া আপা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে এখন হসপিটালে, ইন্‌টেনসিভ্ কেয়ার-এ, সালিলা fly করে চলে গেছে টুসানে, ওয়াশিংটন-এ ওর Graduation-এর অনুষ্ঠান ফেলে। নিশ্চুপ হয়ে থাকি। কেবল শুনি। কিছু বলি না। আমি যতদূর জানি, ম্যাসিভ্ একটি স্ট্রোক এবং ম্যানিনজাইটিস্ থেকে আপার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর মাস তিনেক আগে সুরাইয়া আপা হঠাৎ করেই একটি অনুরোধ করেছিলেন আমাকে। কণ্ঠস্বরটি শিশুর মতো লাগছিলো, মমতাভরা, এখনো কানে বাজে। আপা খুব চাচ্ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভ থেকে ওনার অভিনীত 'শেষের কবিতা' নাটকটির একটি কপি পেতে। আপার কাছে কোনো কপি ছিলো না। উনি খুব চাচ্ছিলেন নিজের অভিনীত নাটকটি আর একবার দেখতে। বিটিভি-তে আমার কাছের কেউ নেই, আমার সেরকম ক্ষমতা বা শক্তিও নেই, কিন্তু এতো মায়া হচ্ছিলো যে আপাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলাম, নাটকটির প্রযোজক ও পরিচালক যেহেতু আতিকুল হক চৌধুরী ছিলেন, ওনার কাছে নিশ্চয়ই একটি কপি থাকতে পারে, আমি বাংলাদেশে যখন যাবো ওনার সঙ্গে দেখা করবো এবং নাটকটির একটি কপি আনার চেষ্টা করবো।

ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, বাঁধা-বিপত্তি, দূর্ঘটনার মুখোমুখি হলেও কোনোকিছুই তাঁকে অবদমিত রাখতে পারেনি। হতাশাকে সুরাইয়া আপা কখনও প্রশ্রয় দেন নি। হিসাব রাখতেন না জীবনের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির। প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী, প্রখর মেধাবী, ভীষণ স্পষ্টভাষী, দুর্দান্ত বক্তা, দৃপ্ত বাচনভঙ্গি এবং রীতিমত ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন সুরাইয়া আপা। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন শিক্ষক, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, বোধ ও উপলব্ধিতে প্রবল অনুসন্ধানী — যাঁর মধ্যে মেধা, প্রতিভা ও সৌন্দর্য একাকার হয়ে মিশেছিলো, যা সত্যিই দূর্লভ।

তাঁর কলাম, কবিতা বা প্রবন্ধগুলো পড়লে যে কেউ বলবেন লেখক হিসেবে সুরাইয়া খানম আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বহু দিক স্পর্শ করেছেন চিন্তার সততা, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও প্রাখর্য নিয়ে। প্রচন্ড অনুভূতিপ্রবণ সুরাইয়া খানম তাঁর আবেগকে সংযত করতে জানতেন মেধা ও নিষ্ঠার একাগ্রতায়। যার ফলে তাঁর কবিতা হয়ে উঠতো হৃদয়গ্রাহী ও অতলস্পর্শী। গভীর জীবনবোধে বিধৃত। এখানেই সুরাইয়া আপার কৃতিত্ব ও সার্থকতা। আর এখানেই তিনি তাঁর সময়ের অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ও অনন্য। আপার একটি কবিতা আছে 'লং ডিস্‌ট্যান্স রানার' শিরোনামে, আমার খুব ভালো লাগে,

কবিতাটিতে সুরাইয়া খানমকে কিছুটা যেনো বোঝা যায়, ধরা যায়। কবিতাটি জানিনা কোথাও প্রকাশিত হয়েছিলো কিনা, আপা আমাকে পাঠিয়েছিলেন 'আকাশলীনা'-র জন্যে। কবিতাটি এইঃ

লং ডিস্ট্যান্স রানার আমি
সদা সর্বদা ফ্রন্টিয়ার পেরিয়ে যাই
যত বেড়াজাল আচার বিচার নিষেধ শাসন
দমন ও ত্রাস — পেরিয়ে যাই। অতিক্রম করে যাই ঘৃণা।
হৃদয়ে ও মেধায় জ্বালাই দীপশিখা
হাতে নিয়ে সে মশাল তীর বেগে ছুটে যাই।
ঐতিহাসিক কলোনিয়াল ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করে যাই।

আমারও ক্লান্তি আছে, নিদ্রা আছে।
আমারও সপ্রেম আশা আছে।
আমি যাবো সুদর্শনা অপরূপা মাতৃভূমিতে।
লং ডিস্ট্যান্স রানার আমি, আমি সেই দেশে যাবো।
এখানে সেখানে নাই, অনুভবে আছে।
আছে মাতৃভূমি আছে, একুশের কুয়াশা ভেজা
চোখের পাতায়।
আমার মেধায় কোন শহীদ মিনার নাই
তারা কেউ হয়নি শহীদ —- তারা মৃত নয়।
তারাও চলেছে সঙ্গে অপরূপা মাতৃভূমি আশে।
আমার সময় নেই, আমি তীক্ষ্ণ ছুটতেই জানি।

সুরাইয়া খানম এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। সবকিছুর উর্ধ্বে চলে গেছেন তিনি। তাঁর কর্মময় জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে চলাই হবে তাঁকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো। জীবনবাদী শিল্প যাপনের ভেতর দিয়ে একজন কবি খুঁজে বেড়ান জীবনের পরম সত্যকে। এক সময় প্রগাঢ় ও বিমূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর সে আবিষ্কার। তখন তিনি নির্নয় করতে চান এক অনাদি অনন্ত সম্পর্কের স্বরূপ সত্যকে। এ সত্যকে সুরাইয়া আপা অনুভব করেছিলেন তাঁর নিজস্ব আবেগে, নিজস্ব অস্তিত্বে, নিজস্ব উপলব্ধিতে। তাই তাঁর মৃত্যু, চলে যাওয়া আমার কাছে হয়ে ওঠে এক নিরূপম যাত্রা অনন্তের দিকে—পরম সত্যের দিকে। তাঁর পরমোজ্জ্বল মানস, সৃজনশীলতা, মননশীলতা, জ্ঞানের ও সুরুচির চর্চার কারণে, এক চমৎকার অনাড়ম্বর অথচ আশ্চর্য ঐশ্বর্যশালী উদ্ভাসে সুরাইয়া খানম আরও বেশী বেঁচে থাকার আস্বাদনে উদ্ভাসিত হয়ে থাকবেন।
সুরাইয়া আপা, যা কিছু মলিনতা তা আর তোমাকে স্পর্শ করবে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অজস্র টানাপোড়েনের ভেতরেও, বেদনার মধ্যেও দৃঢ়তার সঙ্গে তুমি তোমার আশাবাদী দীপ্র মশালটিকে উর্ধ্বে তুলে ধরে রেখেছিলে। তুমি ছিলে হীরক খন্ডের মতোই উজ্জ্বল আর দ্যুতিময়! জীবন চলে যায়, চলে যাচ্ছে, চলে যাবেও আপন নিয়মে। তবুও এই যাওয়ার মধ্যেও কেউ কেউ সত্যিই হেঁটে যায় সময়ের গন্ডি উৎরিয়ে। তুমি ছিলে তাঁদেরই একজন। একজন লং ডিস্ট্যান্স রানার!

কামরুন জিনিয়া
নিউ অরলিন্স, লুইজিয়ানা।